কোরানিক বিজ্ঞানের উৎস সন্ধানে-৩ (শেষ পর্ব)

-জাহেদ আহমদ
jahed73@aim.com

পাঁচঃ

[গত পর্বে স্টেম সেল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে গিয়েছে। এতদূর অবধি আমি যে সব স্টেম সেল বর্ণনা করেছি, তাদেরকে ভ্রূণ জাত (embryonic) স্টেম সেল বলা হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে *ইউনিভার্সিটি অব মিনেসটা*-র ডঃ ক্যাথেরিন ভেরফেইলি-র পরীক্ষা থেকে জানা যায়, ভ্রূণ ছাড়া ও এডালট বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শরীরের অংগের কোষ যথাঃ অস্থিমজ্জা (bone marrow) থেকে ও অনেক সময় ষ্টেম সেলের জন্ম দেয়া সম্ভব। অবশ্য পরবর্তীতে এডালট স্টেম সেলের সাফল্য embryonic স্টেম সেলের সাফল্যের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ২০০১ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ সাইন্স জার্ণাল *ন্যাচার (nature)*-এ বিষয়ে দুটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং ডঃ ক্যাথেরিন ভেরফেইলি ও embryonic স্টেম সেলের তুলনায় এডালট স্টেম সেলের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে বেশ কয়েকজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আবেদন জানিয়েছিলেন, যেন স্টেম সেল গবেষণার দ্বার চিরতরে রূদ্ধ করে দেয়া না হয়। একটি বিষয়ে সকল জীব বিজ্ঞানীরাই মোটামোটি একমত- embryonic এবং এডালট—উভয় প্রকার স্টেম সেলের উপর আমাদের প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রেসিডেন্ট বুশ সেরকম গবেষণার পথটি আইন দ্বারা একেবারেই সীমিত করে দিয়েছেন। আমেরিকাতে কেবলমাত্র এডালট স্টেম সেলের উপরে সীমিত আকারে গবেষণা আইনত সিদ্ধ, যদি ও অনেক রিপাবলিকান যেমনঃ সদ্য প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রিগ্যান (*এলঝাইমারস* রোগে ভোগে মারা গেছেন) এর স্ত্রী ন্যান্সি, ছেলে মেয়ে ও স্টেম সেল রিসার্চ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- **USA TODAY, 20 April 2004 issue/*Boston Globe*, 01 Nov. 2004 issue** *আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি জাপানে পি-এইচ-ডি গবেষণার ছাত্র আমার বন্ধু ও এক সময়ের সহপাঠি ফেরদৌস হাসান টিটুকে এডালট স্টেম সেল বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য।]*

"I can't give you brains, but I can give you a diploma."

-- The Wizard of Oz

নটরডেম কলেজে যাঁরা '৮০ থেকে '৯০ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছেন, তাঁরা গণিতের কৃতি অধ্যাপক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের *গোলড মেডেলিস্ট*) কার্তিক চন্দ্র সাহাকে চিনবেন। স্যার মারা গিয়েছেন বছর কয়েক আগে। আমাদের তিনি গতিবিদ্যা (dynaimcs) পড়াতেন। ক্লাশে আমাদের ফাঁকিবাজির সুযোগ একেবারেই ছিল না স্যারের অসাধারণ দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্নতার কারণে। ব্ল্যাকবোর্ডে ঝুঁকে অংক বোঝানোর সময় ও স্যারের ঠিকই খেয়াল থাকত সেই পিছনের বেঞ্চে বসে কেউ গল্প করছে কি-না। প্রায় সময় অংক বোঝানোর পর স্যার আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতেন, *'বুঝেছ?'* তারপর কিছুক্ষন দম নিয়ে বলতেন, *'আসলে কিছুই বুঝ নাই'। 'বুঝবা ক্যামনে?'* বলে স্যার শুরু করতেন, *'আমার এক বন্ধু ছিল। একটা বিশেষ অংক দিয়ে সে আমাদের বলত, কেউ তাঁকে সেটি বুঝাতে পারলে সে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবে। কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে কোন দিন সহজ অংকটি বুঝিয়ে পাঁচ শত টাকা জিততে পারিনি। অবশেষে সে একদিন বলল, 'তোরা আমাকে ক্যামনে বুঝাবি? তোরা যতই বুঝাস না ক্যান, আমি তো বুঝমই না।'* আসলে স্যার বলতে চাইতেন, কেউ যদি পূর্ব থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকে যে, সে কোন একটি বিষয়ে কখনোই অজ্ঞতা স্বীকার করবে না, তাঁকে বুঝানো কার বাপের সাধ্য? বোঝার জন্য যা বেশি দরকার তা হচ্ছে খোলা মন, মহাপ্রতিভা নয়। আরেকটি অভিজ্ঞতা বলি। বেশ কয়েক বছর আগে মোটামোটি ভালই লেখাপড়া জানা এক মুমিন ভদ্রলোক *ক্বোরাণ ও বিজ্ঞান* বিষয়ে আমার সাথে তর্ক শুরু করে দিলেন এই বলে, 'এই যে তোমরা ডি-এন-এ, জিণ এগুলি নিয়ে এত কথা বল, পবিত্র আল-ক্বোরাণে তো জ্বীন *(যা আসলে ভূত-প্রেত-শয়তান অর্থে -লেখক)* বিষয়ে পুরো একটি সুরা রয়েছে।' আমি ভদ্রলোকের সাথে তর্কে যাইনি দেখে আরেক মুমিন বলে বসলেন, 'ইনি *(ঐ ভদ্রলোক)* অনেক পড়াশুনা জানা লোক। আপনি পাত্তা পাবেন না।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জামিলুল বাসার ইতিমধ্যে এই সিরিজে আমার লেখা পর্ব-২ এর একটা উত্তর* দিয়েছেন। ভাল লাগল জেনে- তিনি আমার বন্ধু ও সহ-মর্ডারেটর অভিজিৎ রায়ের লেখার প্রশংসা করেছেন। খারাপ লাগল এই ভেবে, অভিজিৎ তো অনেক জটিল বিষয়াদি নিয়ে লিখে থাকে, যা বুঝতে আমি নিজে ও মাঝে মাঝে হিমশিম খাই, অথচ জামিল সাহেব তা স্বচ্ছন্দে পড়তে ও বুঝতে পারেন। অন্যদিকে *ক্বোরাণ বনাম বিজ্ঞান* বিষয়ে এ পর্যন্ত আমি যে সব উদাহরণ টেনেছি তা খুবই সাধারণ এবং বেসিক, বিশেষত জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। পোড়া কপাল, ভদ্রলোক তা ও বুঝতে পারেন না! উনার জবাব বারকয়েক পড়লাম। মনে হল না, বুঝার কোন সমস্যা আছে। ব্যাপার সম্ভবত অন্যখানে। আর তাই কার্তিক স্যারের গল্প মনে পড়ল।

এবার দেখা যাক, জামিল সাহেব কি ভাবে বিনয় (?) এর সাহায্যে এক দিকে বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে ও পর মুহূর্তেই আবার অনড় থেকেছেন নিজ অবস্থানে অর্থাৎ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন *'ক্বোরাণের মধ্যে বিজ্ঞান রয়েছে'*- এই ভ্রান্ত ধারণাটি। তার আগে আরেকটা কথা। আমার নামের শেষে বানান আমি 'আহমদ' লিখি। উনি 'আহম্মদ' লিখাতে আমি একটু আপত্তি করাতে উনি আবার এই 'আহম্মদ' নামের একটি নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দিলেন। সবশেষে বললেন, *'যা হোক আমার ভুলের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।'* ভাই সাহেব, ভুল সীকার করলেই কেউ ছোট হয় না। আর আপনাকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অতএব, *ভাংগব তবু মচকাব না*- এই জাতীয় অহেতুক নীতি বর্জন করলে সকলেরই উপকার হয়।

ছয়ঃ

নিচে বাসার সাহেবের কিছু সেলফ-কন্ট্রাডিকটরি বক্তব্য *(ইটালিক ও গাঢ় লাল রংগে)* তুলে ধরছি, সাথে আমার জবাব ও।

একদিকে জামিল সাহেব বলেছেনঃ

> *জীব বা অস্র বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারেই মূর্খ। ..... বিজ্ঞানের ছাত্র ওনই! গুরু ও নই! অস্র বিজ্ঞান* (এটি আবার কি জিনিস?- লেখক) *না বুঝলে ও বিজ্ঞান নিয়ে কখন ও বিতর্ক করি না। ..... হযরত মোহাম্মদ (সা) জানতেন বা আবিষ্কার করেছেন এমন কথা কোথাও লেখা নেই, আছে বলে গেছেন। ..... তিনি জানতেন কি জানতেন না! তা তিনিই জানতেন!* (তাহলে আপনি কি করে জানেন যে, মুহুম্মদ জানতেন? -লেখক) ..... *দীর্ঘ দু'বৎসর যাবত বাসারের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটি বাক্য বা শব্দ ও নেই।*

এবার দেখুন, কি ভাবে এই একই লোক *(যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে নিজেকে 'মূর্খ' বলে দাবি করেছেন)* মরিয়া হয়ে ওঠেছেন ক্বোরাণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মিশনে এই বলেঃ

> *চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, উল্কা, সৌরজগত, মহা সৌরজগত, পৃথিবীর জরায়ুতে সর্বত্রই জীব জীবন ছিল ..... সাত হাজার বছর (?) আগের বেদ-কোরাণ ইহাই বলে ।*

- জামিল সাহেব, আপনার কথাই আপনাকে ফিরিয়ে দেইঃ *'সাত খন্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?'* বেদ-বাইবেল-কোরাণের গাঁজাখুরি কথাকেই যদি আমি বিজ্ঞান বলে মেনে নিতাম, তাহলে নিশ্চয় এত কষ্ট করে আপনার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হতাম না; আপনার মূল্যবান সময় ও নষ্ট করতাম না। বেদ কয়েক হাজার বছর থেকে পৃথিবীতে আছে, ক্বোরাণের বয়স ও দেড় হাজার বছরের কাছাকাছি (সাত হাজার নয়); সেই তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র কয়েকশ বছর। অথচ দেখুন, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, টেলিফোন, রেল-কার, উড়োজাহাজ, কম্প্যুটার- সবই কিন্তু গত দু'তিনশ বছরেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কেন *মহাবিজ্ঞানী* মুহম্মদ এগুলির একটি ও আবিষ্কার করতে পারেননি? চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটা মোটরযান সে সময় থাকলে উটের পৃষ্ঠে চড়ে সংবাদবাহককে কষ্ট করে রোদ-বৃষ্টি পোহায়ে মুহম্মদের সংবাদ নিয়ে এখানে সেখানে যেতে হত না। রিমোর্ট কন্ট্রোলড ফাইটার প্লেন বা মিসাইল থাকলে ঘর থেকে শত্রু নাশ করা যেত ,অকারণে মুহম্মদের সাহাবীরা মারা যেতেন না; তাঁর নিজের দন্ত (মোবারক) গুলি ও তিনি খোয়াতেন না শত্রুর পাথরের আঘাতে। তাহলে কেরামতি বলে কিছুই ছিল না! তথাপি মজার ব্যাপার এই- একই মুহম্মদ বিশেষ বাহনে চড়ে সাত-আসমানের উপরে আল্লাহ সুবহানুতা'লা, বেহেস্ত-দোযখ দেখেছেন—এই কাহিনী শুনে মুমিনদের আবেগে চোখে জল চলে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোন প্রশ্ন আসে না। কাজেই, আগে যেমনটি বলেছি, কার্য-কারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কোরাণ-বেদকে না মিলিয়ে দু'টোর একটিকে বেছে নিলে অহেতুক *প্যাঁচালের* হাত থেকে সকলেই রক্ষা পাই। কেউ ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলে বিশ্বাস করলে আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু এই ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের বর্ণনাকে *বৈজ্ঞানিক* আখ্যা দিলে, আমি তাতে তীব্র আপত্তিই তুলব না; আমরণ এই মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়ে যাব—আমার শক্তির সীমাবদ্ধতা স্বত্তে ও। এবার জামিলুল বাসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ প্রমাণ চাই, বিজ্ঞানের কোথায় আছে, কিংবা কবে, কোথায়, কোন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, *চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, উল্কা, সৌরজগত, মহা সৌরজগত, পৃথিবীর জরায়ুতে সর্বত্রই জীব জীবন ছিল?* আমরা জানি, বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত পৃথিবী গ্রহের বাইরে সুস্পষ্ট ভাবে আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাননি। আপনি কি দয়া করে ব্যাপারটির একটু মীমাংসা দিবেন?

ভ্রূণ বিদ্যা (embryology) এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং ভ্রূণ সম্পর্কে ক্বোরাণের ভ্রান্তপূর্ণ ধারণা

জামিলুল লিখেছেনঃ

> *জরায়ুতে লিঙ্গের আত্ন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কৃতি বিজ্ঞানিগণের ঘাস কাটা ছাড়া স্নোগ্রাফ কোন কাজে লাগে না! ১/২ মাসে বলতে পারে? আগত শিশু নারী কি পুরুষ?*

- বিজ্ঞানীদের নিয়ে এমন খেদোক্তি করেন, আবার বলেন, *'দীর্ঘ দু'বৎসর যাবত বাসারের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটি বাক্য বা শব্দ ও নেই।'* তবে আশা করি ঈমানচ্যুত হবেন না জেনে যে, *কৃতি বিজ্ঞানিগণ* আপনার বেঁধে দেয়া সময়ের কাছাকাছি চলে গেছেন মাতৃজঠরে থাকা শিশুর লিংগ আগাম বলে দেয়ার ক্ষেত্রে। **Chorionic Villus Sampling (CVS)** পরীক্ষা দ্বারা ভ্রূণের তিন মাস সময়েই এখন সেটা বলে দেয়া সম্ভব। আর ও এক প্রস্থ দুঃসংবাদ রয়েছে ক্বোরাণিক মোল্লাদের জন্য। গবেষণাগারে শুক্রাণু পৃথকীকরণ **(sperm sorting)** প্রক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন এবং তা সফল হলে একদিন হয়তো দেখা যাবে, আগত শিশু ছেলে না মেয়ে হবে— তা জাইগোট সৃষ্টির *(in vitro)* প্রথম দিনেই বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারবেন পুর্বে পৃথকীকৃত শুক্রাণুটি x না y, তা জেনে নিয়ে। আর ও দুঃসংবাদ রয়েছে তাদের জন্য, যারা 'মনুষ্য-সৃষ্ট বিজ্ঞান'-এর প্রতাপ ও বিস্ময়কর অগ্রগতিকে মেনে নিতে না পেরে নিজেদের অজান্তেই আল্লাহ-ভগবান-গডকে বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না, ধর্মগ্রন্থের সাথে তাঁদের আবিষ্কারের মিল-অমিলের চিন্তা নিয়ে; কিন্তু মোল্লারা মাথা ঘামায়। মাথা ঘামাতে হয়, না হলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থগুলি সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসের ভিতটি নড়বড়ে হয়ে যায়। ক্বোরাণ-বাইবেল অনুযায়ী, নর এবং নারীর মিলন ছাড়া শিশুর জন্ম দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ক্লোনিং এর মাধ্যমে *ডলি* নামক ভেড়ীর সৃষ্টি সেই ধারণাকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। তবে তার আগে পুরুষ স্পার্ম বা শুক্রানু এবং নারী ওভ্যাম বা ডিম্বানু সম্পর্কে কিছু অতি সাধারণ *কিন্তু* জরুরী বিষয় জেনে নেই। জামিলুল বাসার নিজে ও এ বিষয়ে ভয়াবহ অসেচতন বলে বুঝলাম প্রশ্নের ধরণ দেখে। শুক্রানু-ডিম্বানু প্রতিটিকে আমি অর্ধ কোষ বা n বলেছি। এটি কেন বলেছি, মন গড়া বলেছি কি-না, জানার ইচ্ছা থাকলে প্রাইমারী স্কুলের থার্ড বা ফোর্থ গ্রেডের বিজ্ঞান বইয়ে *কোষ এর গঠন এবং আকৃতি* পড়ে নিলেই বাসার সাহেব বুঝতে পারতেন। অবশ্য *ক্বোরাণেই সব আছে* বিশ্বাস করলে এরকম বিড়ম্বনা পোহাতেই হবে। বাসার সাহেবের প্রশ্ন নিচে দেখুনঃ

....শুক্রকীটগুলি দৈত্য ক্যামেরা (অণুবীক্ষনযন্ত্র আবার *দৈত্য ক্যামেরা* হল কবে থেকে? -লেখক) দিয়ে দেখলে কি অর্ধাংগ মনে হয়?নারীর ডিম্বানু দেখলে কি অর্ধ ডিম্ব মনে হয়? ..... হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পানির দুটি অর্ধাংগ; তাই বলে কি হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন নিজে অর্ধাংগ **?????**

এবার দেখা যাক, এ বিষয়ে জামিলুল বাসারের ভ্রান্তির অবসান ঘটে কি-না।

দুই ধরণের কোষের সমন্বয়ে মানুষের শরীর গঠিত। একটি হচ্ছে- দেহ কোষ **(somatic cell)** ,আরেকটি হচ্ছে জনন কোষ **(germ cell)**। পুরুষের জননাংগের শুক্রাশয় **(testis)** এবং নারীর জননাঙ্গের ডিম্বাশয় **(ovary)**-এর কোষ ব্যতিত শরীরের বাকী সকল কোষগুলিই দেহ কোষ এবং এগুলিতে স্বাভাবিক কোষের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু সকল প্রাণির দেহ কোষের নিউক্লিয়াসে সর্বমোট ক্রমোজোম *(যেটিতে ডি-এন-এ একের পর এক প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে)* এর সংখ্যা নির্দিষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে তা ২৩ জোড়া বা ৪৬ টি। অর্থাৎ, মানুষের শরীরের সকল দেহ কোষেই তেইশ জোড়া ক্রমোজোম রয়েছে *(সে হৃদপিন্ড বা চামড়ার কোষ, যাই হোক না কেন)*। তবে এই ২৩ জোড়ার মধ্যে লিংগ নির্ধারণকারী এক জোড়া ক্রমোজোম **(sex chromosome)** রয়েছে যা ছেলেদের ক্ষেত্রে দু'রকমঃ **x** এবং **y,** কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দু'টি ক্রোমোজোমই এক অর্থাৎ, **xx** । নারী-পুরুষের শারীরিক গঠনগত পার্থক্যের মূলে এই এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোমই **(xy** বা **xx)** মূলত দায়ী। ফিরে আসি জনন কোষে। একেকটি জনন কোষে *(পুরুষের ক্ষেত্রে স্পার্ম, বা শুক্রানু এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ওভ্যাম বা ডিম্বানু)* দেহ কোষের ঠিক অর্ধেক সংখ্যক ক্রমোজোম থাকে অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে তেইশ জোড়া নয়, কেবল তেইশটি। মনে রাখা দরকার, ভ্রূণের প্রাথমিক বৃদ্ধি-বিকাশ থেকে শুরু করে মানব শিশুর শরীরের অংগ প্রত্যঙ্গের বিকাশ সবই ঘটে *মাইটোসিস* নামক কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় যেখানে কোষ বিভাজনের আগে ও পরে কোষে মোট ক্রমোজোমের সংখ্যা সর্বদাই সমান থাকে (২৩ জোড়া)। কিন্তু জনন অঙ্গের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে *মিয়োসিস* নামক কোষ বিভাজন ঘটে থাকে যার সরল মানে হল- এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোষে ক্রমোজোম সংখ্যা সর্বদাই দেহ কোষের ক্রমোজোমের অর্ধেক (বা, ২৩ টি মাত্র)। দেহ কোষকে তাই **২n** বা ডিপ্লয়েড সেল এবং জনন কোষকে **n** বা হ্যাপ্লয়েড সেল বলা হয়।

শুক্রানু এবং ডিম্বানুকে আমি অর্ধ কোষ বা **n** বলার পিছনে এই হচ্ছে *শানে নুযুল* (ব্যাখ্যা)। জামিল সাহেব সম্ভবত ধরে নিয়েছেন, মুরগীর ডিমের মত নারীর ডিম্বানু ও অনেক বড় আকৃতির এবং সেই তুলনায় পুরুষের শুক্রানু যেহেতু বহু ক্ষুদ্র , তারা 'অর্ধাংশ' হতে পারে না *(যা তিনি আকৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন)* । আশা করি, প্রাইমারি লেভেলের হলে ও একটা বায়োলজি বা জীব বিজ্ঞান বই একটু পড়ে ও হজম করে আমার দেয়া ব্যাখ্যার সাথে মিলাবেন। কোথাও গরমিল পেলে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

ক্লোনিং এর কথায় ফিরে আসি। ক্লোনিং নীতি অনুযায়ী, পুরুষের সাহায্য এবং শারীরিক মিলন ছাড়াই একজন নারীর *(মানুষ বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী)* পক্ষে শিশুর জন্ম দেয়া সম্ভব। মানব ক্লোনিং-এর নৈতিকতা নিয়ে আমি আলোচনায় যাব না, সেটি সম্পূর্ণ আলাদা ইস্যু। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- সবজান্তা ঈশ্বর কি করে বুঝতে পারেননি যে, এমন ও সময় আসবে পুরুষের সাথে কোন প্রকার শারীরিক সম্পর্ক ব্যতিতই নারী বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে? আর তা ও একেবারে হুবহু কার্বন কপি? *নাকি,* ক্লোনিং বিষয়ে ও ক্বোরাণে ইংগিত রয়েছে কিন্তু আমরা *অবিশ্বাসী-পাপীরা* তা দেখতে পাচ্ছি না?

কি ভাবে *ডলির* সৃষ্টি হয়েছিল-এই সুযোগে বলে রাখি *(একই বিষয়ে আবার লিখার আমার হয়তো সুযোগ হবে না, আর পাঠক-পাঠিকার ও নিশচয়ই তা পড়তে ভাল লাগবে না)*। আগের পর্বে সংক্ষেপে লিখেছিলাম কি ভাবে হ্যাপ্লয়েড শুক্রানু ও হ্যাপ্লয়েড ডিম্বানুর মিলনে জাইগোট (ডিপ্লয়েড)-এর সৃষ্টি হয়। এখানে সেটির পুনুরাবৃত্তি না করে কেবল একটি
স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম যোগ করছি (নিচে দেখুন)-

চিত্র-১ (Ref.http://www.synapses.co.uk/science/clone.html)

ডলি ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে আলাদা এবং বিজ্ঞানীদের নজর কেড়েছে তা হচ্ছে- বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত এডালট বা প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণির দেহ কোষ থেকে প্রায় একই রকম আরেকটি *কার্বন কপি* প্রাণি তৈরী করেছেন। আর ও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে- এই প্রক্রিয়াটিতে অংশ গ্রহণকারী তিনটি প্রাণিই স্ত্রী জাতীয় অর্থাৎ, কোন পুরুষ শুক্রাণুর প্রয়োজন পড়েনি (যা টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়)। এবার *ডলি* ক্লোনিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলি জেনে নেইঃ

- মাইক্রো নিডল (micro niddle) এর সাহায্যে *ফিন সেট* উপ-প্রজাতির ভেড়ীর ম্যামারি গ্লান্ডের কোষের (ডিপ্লয়েড) সাইটোপ্লাজম *(কোষের নিউক্লিয়াস ব্যতিত তরল পদার্থ এবং অন্যান্য বস্তু)* থেকে কেবল ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি সংগ্রহ করা হয়। স্কটিশ *ব্ল্যাক ফেস* উপ-প্রজাতির ভেড়ীর ডিম্বানু -এর ক্ষেত্রে ঠিক উলটো কাজটি করা হয়েছে *অর্থাৎ*, সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসটি মাইক্রো নিডল-এর সাহায্যে *নক আউট* করা হয়েছে বা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে ডিম্বানুটি জেনেটিক মেটেরিয়াল *(নিউক্লিয়াস)* হারালে ও এতে এখন ও রয়ে গেছে সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া *(কোষের শক্তি উৎপাদন অংগানু)*, যা একটি শুক্রানুর নেই। আর যেহেতু এটি একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ীর ডিম্বানু , এর সাইটোপ্লাজমটি উপযুক্ত পরিবেশে জাইগোটে পরিণত হওয়ার সকল ক্ষমতাই রাখে। আমাদের দরকার কেবল নিউক্লিয়াসের অভাবটি পূরণ করা। এখানে স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা চালাকিটা করেছেন।

- বিজ্ঞানীরা *ফিন সেট* ভেড়ীর দেহ কোষ থেকে সংগৃহীত নিউক্লিয়াসটি এবার স্কটিশ *ব্ল্যাক ফেস* ভেড়ীর নিউক্লিয়াসবিহীন ডিম্বানুর সাইটোপ্লাজমে জুড়ে দিলেন (fused) দিলেন মৃদু বৈদ্যুতিক চার্জ ব্যবহার করে। চার্জের ফলে আরেকটি লাভ হল এই- হাইব্রিড কোষটি (যা এখন জাইগোটের সমকক্ষ) আর ও সক্রিয় হল যা কোষ বিভাজনের জন্য জরুরী।

- হাইব্রিড কোষটি এবার একটি পুর্ণাংগ জাইগোট হয়ে গেল *(ফিন সেট* ভেড়ীর জেনেটিক মেটেরিয়াল + *ব্ল্যাক ফেস* ভেড়ীর সাইটোপ্লাজম)। এখন দরকার কেবল জাইগোটের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা। নিয়ে আসা হল, আরেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক *ব্ল্যাক ফেস* ভেড়ী যার জঠরে (uterus) এ স্থাপন করা হয় নতুন জাইগোটটি। ১৪৮ দিন পর *ডলি* মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়।

পুরো ব্যাপারটি নিচের চিত্রে তুলে ধরা হল ঃ

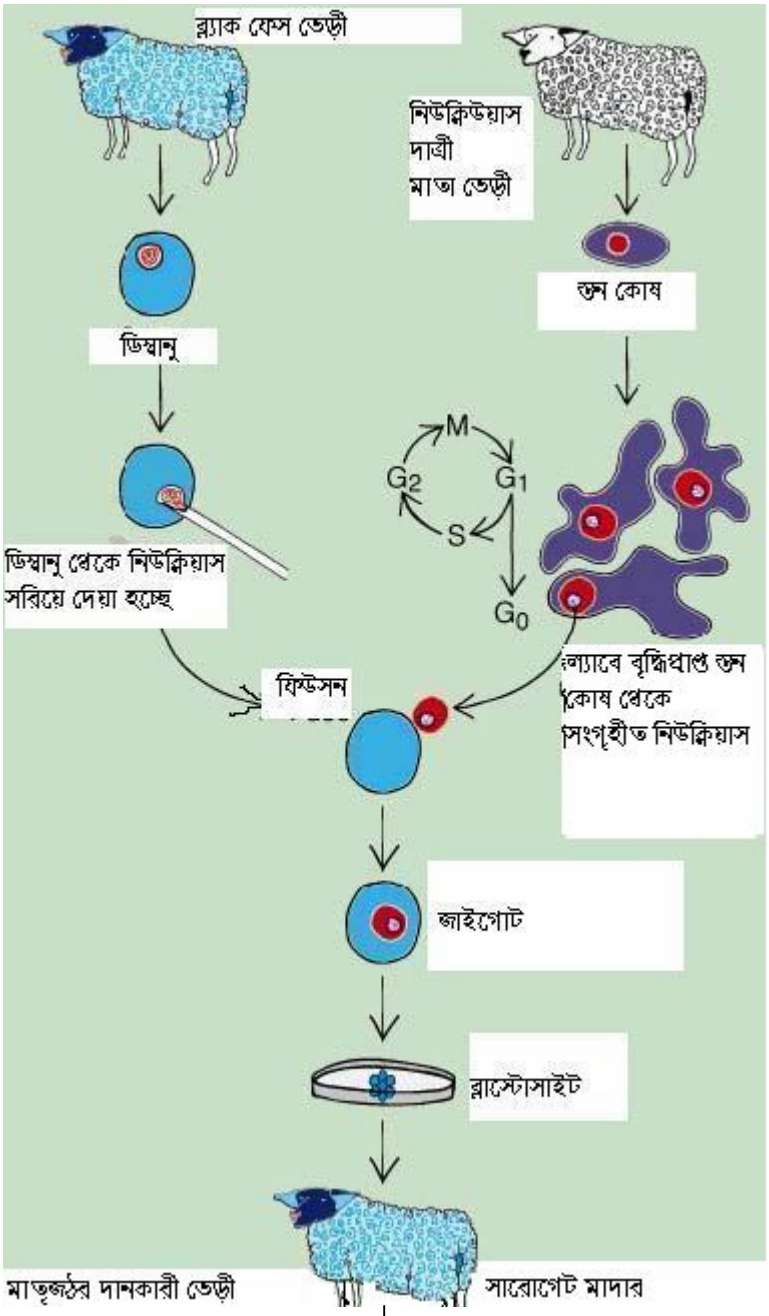

চিত্র–২ (Ref.http://www.synapses.co.uk/science/clone.html)

আর এ ভাবেই জন্ম নেয় মানুষের পরে মিডিয়াতে সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে আলোচিত প্রাণি *ডলি।* জেনেটিক্স বা আণবিক জীব বিজ্ঞানের **(molecular biology)** কোন ছাত্র এটি শুনে আশ্চর্য হবে না যে, ডলি বাহ্যিক এবং গঠনগত ভাবে পুরোপুরি হয়েছে *ফিন সেট* ভেড়ীর মত। কারণ- জেনেটিক মেটেরিয়াল আমাদের শারীরিক গঠন নির্ধারণ করে আর *ডলির* নিউক্লিয়াসটি এসেছে *ফিন সেট* ভেড়ীর দেহ কোষ থেকে। তবে এখানে জেনে রাখা দরকার, ডলির শারীরিক গঠন হুবহু নিউক্লিয়াসদাত্রী *ফিন সেট* ভেড়ীটির মত হলে ও ডলির সকল অভ্যাস ও আচরণ যে নিউক্লিয়াসদাত্রী ফিন সেট ভেড়ীটির মত হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই কেননা- প্রাণি চরিত্রের সবকিছুই কেবল জিণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; বরং জিণ এবং পরিবেশের যৌথ প্রভাবই তা নির্ধারণ করে থাকে।

চিত্র-৩: বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান জার্ণাল *nature*-এর প্রচ্ছদ কাহিনীতে *ডলি*

উপরে বর্ণিত *ডলি* সৃষ্টির কাহিনীটা শুনতে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হলে ও পাঠক-পাঠিকারা জেনে অবাক হবেন, স্কটল্যান্ডের *রজলিন ইনস্টিটিউট* এর ডঃ ইয়ান উইলমাট এবং তাঁর দল (ডঃ কেইথ কেমবেল, *টেকনিশিয়ান* বিল রিচি) ডলি ক্লোনিং-এ নিউক্লিয়াস ট্রানসফারের ক্ষেত্রে **২৭৬ বার চেষ্টা করার পর ২৭৭তম চেষ্টাতে সফল হন!** এ তথ্যটি এ জন্য তুলে ধরলাম যাতে আমরা বুঝতে পারি, বিজ্ঞানীদের এক একটি আবিষ্কারের সাথে কেবল মেধাই জড়িত নয় *(যেমনটি অনেকে ভুলবশত মনে করে থাকেন);* অমানুষিক পরিশ্রম এবং আপরিসীম ধৈর্য্যের ব্যাপারটি এর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পর্ব এক-এ আমি দেখিয়েছি ডি-এন-এ-র অস্তিত্ব, গঠন-প্রকৃতি আবিষ্কারে মোট সময় লেগেছিল ৮০ বছরের ও অধিক (১৮৬৯-১৯৫৩)। জামিলুল বাসার জাতীয় ভদ্রলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে যখন একদিকে এই দাবী করেন: *জীব বা অস্ত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারেই মূর্খ ;* আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের কঠিন পরিশ্রম, নিষ্ঠা, বহু বছরের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাসের ওপর গড়ে ওঠা এক একটি আবিষ্কার ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের নামে চালিয়ে দিতে চান, তখন তাঁদের সেই বক্তব্যকে আমরা কি ভাবে গ্রহন করব? এবার ভ্রূণ সম্পর্কে ক্বোরাণে একাধিকবার বর্ণিত আরেকটি ভ্রান্তির দিকে চোখ ফেরানো যাক।

আগের পর্বে বলেছি, 'ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, *জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩:১৪, ৭৫:৩৮, ৯৬:২)* যার সাথে বিজ্ঞানের বেমিল ছাড়া কোন মিল নেই।' *জমাট রক্ত* প্রসংগ ঘুরে ফিরে বার বার কেন ক্বোরাণে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খোঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে মুহম্মদ পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে।

মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরিস্টটলের জন্মের (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় এক হাজার বছর পরে । দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখন ও (এমনকি এর পরে ও) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এ সব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকে ও প্রভাবিত করেছিল । এ ক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয়। যীশু, গৌতম বুদ্ধ ও নিরক্ষর ছিলেন। *জমাট বাঁধা রক্ত (আলাক্বা, আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি* এসেছে মূলতঃ গ্রীকদের কাছ থেকে। এরিস্টটলকে জীব বিজ্ঞানের জনক বলা হলে ও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্ত ধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর উপর পুরুষ বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। *জমাট বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের* ক্বোরাণিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলণ ঘটেছে। সন্দেহ নেই, ক্বোরাণের এই ধারণাটি মারাত্নকভাবে ভুল অথচ জামিলুল বাসারের মত মুমিনরা এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবমমাত্র এই অন্ধ বিশ্বাসের কারণে- *ক্বোরাণ আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে।* মূলতঃ ভ্রুনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই যেখানে ভ্রুনকে জমাট রক্তের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে এই ভুলটি হতে পারে অর্থাৎ, ভ্রুনকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যখন মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরে ও যদি মেনে নেই, ভ্রুনটি জমাট রক্ত সদৃশ তাহলে ও ভুলে যাওয়া চলবে না, এটি কেবল মৃত ভ্রুণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ, যেটির আর পূর্ণাংগ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রসায়ণিক (biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল, যাতে তথাকথিত *ক্বোরাণিক বিজ্ঞানের* সমর্থকরা মন-গড়া ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পান।

জমাট রক্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আঘাত বা দূর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ না ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্ত কোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং এরা আঠাঁলো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ (plug) তৈরী করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকা গুলি থেকে একই সময়ে রক্ত প্লাজমায় বিশেষ এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে *ফাইব্রিনোজেন* তখন *ফাইব্রিনে* পরিণত হয়। ফ্রাইবিন হচ্ছে এক ধরণের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্ত কোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

জামিলুল বাসারের বাকী প্রশ্নের উত্তর এবং মন্তব্যের অন্তসারশূণ্যতা তুলে ধরার আগে গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে তথাকথিত 'মহাগ্রন্থ আল-ক্বোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক, কেননা- ভ্রূণ বিদ্যার মত এটি ও *ক্বোরাণিক বিজ্ঞানী* এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ক্বোরাণঃ তেলে-জলে মেশানোর আরেক চেষ্টা

সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) অনেক মুসলিম মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা ক্বোরাণ এর সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। বরং, এঁদের কারো কারো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সরাসরি দেখিয়ে দিয়েছে- বিজ্ঞানের বিচারে ক্বোরাণের আয়াতের অসারতা। যেমনঃ ক্বোরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা *muddy spring*-এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে *সূর্য পুর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়* মনে হলে ও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা, মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষ পথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ, ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকী জায়গায় অন্ধকার অর্থাৎ, রাত। কিন্তু ক্বোরাণে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোন মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় প্রায় সকলে বিশ্বাস করতেন- পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র *(একে বলা হয় এরিস্টটলের ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা geocentric theory of universe)।* তবে মুসলিম গণিত বিদ ও জ্যোতিবির্দ আল-বিরুনি তখন ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে , ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটে ও চ্যাপ্টা নয়। বিজ্ঞানী বলতে হলে তাই বিরুণিকে বলা উচিৎ, মুহম্মদকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় না যে, ক্বোরাণ আসলে মানুষেরই তৈরী একটি গ্রন্থ? তা না হলে, *মহাজ্ঞানী* আল্লাহ কি করে সক্রেটিসের ভ্রান্ত মতবাদগুলি *সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-ক্বোরাণের* পাতায় নিয়ে আসলেন? ক্বোরাণে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আর ও অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্বোরাণের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্বোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০)বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সব শেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরীর মোট সময়

সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ (নাকি, মুহম্মদ?) তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমনঃ ক্বোরাণের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই ক্বোরাণের ৪১:৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরী করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও চার দিন (আয়াত ৪১:১০) । সবশেষে বেহেস্ত তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও দুই দিন (আয়াত ৪১:১২ অনুযায়ী) অর্থাৎ, এই হিসেব অনুযায়ী, বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) বা, সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে *মহাসত্য গ্রন্থ* আল-ক্বোরাণের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

সাতঃ

আগে যেমন উল্লেখ করেছি, *ভাংগব তবু মচকাব না*- এটি হচ্ছে ক্বোরাণিক বিজ্ঞানী এবং ক্বোরাণিক বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের অন্যতম একটি প্যাথলজিকাল উপসর্গ; তিনি ডঃ শমসের আলী, কিংবা জামিলুল বাসার যে-ই হোন না কেন। সংগত কারণে আমি উপরের আলোচনায় জামিলুল বাসারকে উদাহরণ হিসেবে টেনেছি, যদি ও ইতিপূর্বে আমি ডঃ শমসের আলীর *ক্বোরাণিক বিজ্ঞান* তত্ত্ব নিয়ে দু' এক জায়গায় লিখেছি। নিচে বাসার সাহেবের আর ও কিছু অবৈজ্ঞানিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তসারশূণ্য বক্তব্যের নমুনা তুলে ধরছি।

> *যিশুর জন্মের প্রায় ৫ হাজার বৎসর আগে বেদ-গীতা বলেছে যে, জীবের মানব জন্ম শেষ জন্ম . এ পর্যায়ে আসতে তার ৮৪ লক্ষ যোনী ভেদ করতে হয়েছে*

-বিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেহেতু বিবর্তন প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়াশীল, বিজ্ঞান কখনোই দাবী করে না যে, *Homo sapiens* হচ্ছে জীবের সর্বশেষ স্তর। এসব কেবল বিজ্ঞানবিমূখ মোল্লাদের মুখেই শোনা যায়। এবিষয়টি আমার বন্ধু বন্যা আহমদ এবং অভিজিৎ রায় চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছে লেখার মাধ্যমে। আপাতত নতুন করে আমার কিছু বলার নেই। তবে উপরের আন্ডার লাইন্ড বাক্যের কোন মর্ম আমি উদ্ধার করতে পারিনি। *৮৪ লক্ষ যোনীর* সাথে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? জামিলুল দাবী করেছেন ক্বোরাণ নাকি বলেছে, *বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে।* এই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আদম-হাওয়া-শয়তান-গন্দম ফল এর সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি? কোনটি মিথ্যা- ক্বোরাণ, নাকি বিজ্ঞান? নাকি জামিলুল সাহেব আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন, ডারউইন নামে কেউ গবেষণা -পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ না চালালে ও বেদ-গীতা-বাইবেল- ক্বোরাণের তথ্যই যথেষ্ট ছিল বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভের জন্য?

> *জীবন ফুকা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান এখন ও শিশু ছাত্র*

-বিনয়ের সাথে প্রশ্ন রাখিঃ বিজ্ঞান বিষয়ে একজন স্ব-ঘোষিত 'মূর্খ' কি করে এই সার্টিফিকেট দিতে পারেন যে, *বিজ্ঞান প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে এখন ও অনেক কিছু জানে না,* মানে হল - *জীবন হঠাৎ করে জীবের মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছে?*

> *বিজ্ঞান কি বলে না? Every action has its reaction? এক হাতে তালি বাজে না? ইট খেলে পাটখেল খেতে হয়?*

-দুটো অত্যন্ত মারাত্নক ভুল এবং তুলনা রয়েছে এখানে। *এক*- ক্বোরাণের যে বক্তব্য জামিলুল সাহেব আইনস্টাইন, ডারউইন, হকিংনস প্রমুখ বিজ্ঞানী ও স্বীকৃতি দিচ্ছেন বলে দাবি করেছিলেন তা ছিল এই: *কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় দিয়ে গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করবে। কারণ উহাদের প্রত্যেকটির স্বীয় কর্মের জবাব দিহি করতে হবে।* বাসার সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন ছিলঃ বলেন তো কবে, কোথায় আইনস্টাইন, ডারউইন, হকিংনস বা অন্য কোন বিজ্ঞানী বলেছেন *কিংবা* বিজ্ঞানের কোথায় উল্লেখ আছে যে, কর্ণ , চক্ষু, প্রত্যেকটি স্বীয় কর্মের জবাবদিহি করে বা করবে? অবাক কান্ড, উনি শরীরের প্রতিটি অংগ কেয়ামতের ময়দানে আলাদা সাক্ষ্য দিবে- এই আজগুবি ক্বোরাণিক আয়াতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে উত্তর দিলেন *বিজ্ঞান কি বলে না? Every action has its reaction? এক হাতে তালি বাজে না? ইট খেলে পাটখেল খেতে হয়? দুইঃ* উনি অজ্ঞতাবশত আইনস্টাইনের নাম উল্লেখ করলে ও সম্ভবত যা বোঝাতে চেয়েছেন তা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ, *প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে,* যা পদার্থ বিদ্যার একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি। *এক হাতে তালি বাজে না,* কিংবা *ইট খেলে পাটখেল খেতে হয়* -জাতীয় প্রবচনগুলি নিউটনের তৃতীয় সূত্র আবিষ্কার হওয়ার আগ থেকেই মানুষের মাঝে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওগুলি বিজ্ঞান ছিল। যেমনঃ আইনস্টাইনের *'জেনারেল থেওরি অব রিলেটিভিটি'* আবিষ্কার হওয়ার বহু আগে থেকেই দার্শনিকদের মধ্যে এই বচন প্রচলিত ছিল- *সব কিছুই আপেক্ষিক।* তাতে কি তা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সমকক্ষ হয়ে যায়? মোটে ও না।

জামিলুল বাসার আরেক জায়গায় মত ব্যক্ত করেতে গিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ

> *যে কোরানের উপর তিল পরিমাণ আস্থা নেই, পাত্তা নেই! অথচ বেশি-কম মেনে ও অস্বীকার করা হয় সে কোরান কে সরাসরি আবর্জনা বলে ও কিসের ভয়ে অস্বীকার করা হয় তা বোধ গম্য নয়।এ জন্য কামরান মির্জাকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ তিনি একমাত্র আপন নামটির ভয় ছাড়া কোরানের বিরুদ্ধে লিখতে কখন ও অন্যের মত নপুংসতা দেখান নি।*

-যে ক্বোরাণ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে আত্নীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করার চাইতে তথাকথিত পরকালের বেহেস্ত-দোযখের পুরস্কার ও শাস্তির উন্মাদনায় মানুষকে বেশি মাতিয়ে রাখে, যে ক্বোরাণ প্রশ্ন-যুক্তিকে মেনে চলে না, সেই ক্বোরানকে আমি সাধারণ একটি গ্রন্থের বেশি কিছুই মনে করি না। নজরুলের লাইন কটি মনে পড়ছে-

হায়রে ভজনালয়
তোমারি মিনার বাহিয়া ভন্ড

গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা ! ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেল চুম্বিছে
মরি মরি!

তবে যেহেতু *আবর্জনা* বলিনি, সেহেতু কেন স্বীকার করব যে বলেছি? বলেছি *'মহাগ্রন্থ কোরাণ ও বিজ্ঞান'* (কোটেশন মার্ক দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছি) জাতীয় সেন্সেশন ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে লিখিত বিশেষ কিছু গ্রন্থের কথা। কোন কিছুর সমালোচনাতে আমি যুক্তিকে সবার উপরে স্থান দেই। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, কোন কিছুর অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক
ও এক তরফা সমালোচনাই পুরুষত্বের পরিচয় (যেমনটি আপনি বলেছেন) তাহলে সেটি তার একান্ত নিজস্ব মতামত। আর কেবল আপনাকে খুশী করার জন্য কেন মিথ্যে বলব যে, আমি একজন নপুংসক। আপনি নিশচয় কেবল আমাকে খুশী করার জন্য বলেননি যে, আপনি একজন 'মুর্খ'? সৎ সাহসের জন্য সেলাম জানাই।

জামিলুল বাসার *ক্লাসিকাল ইসলাম*কে *নাস্তিকদের নুতন আবিষ্কার* বলে মন্তব্য করেছেন। এতে যথেষ্ট পরিমাণে বোঝা যাচ্ছে- কিছু কিছু ইসলামী কেতাব আত্নস্থ করলে ও ভদ্রলোক ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এখন ও ভয়াবহ পরিমাণে অজ্ঞ রয়ে গেছেন। না হলে জানতেন, *ক্লাসিকাল ইসলাম* বলতে ইতিহাসের সেই সময়টুকুকে বোঝানো হয়ে থাকে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইসলাম ছিল পৃথিবীর অগ্রগামী সভ্যতা। অষ্টম শতাব্দী থেকে তেরোশ' শতাব্দী-মধ্য যুগের ইতিহাসের এই পাঁচশ বছর সময়ের মুসলিম সভ্যতাকে *ক্লাসিকাল ইসলাম* বা *গোলডেন এজ অব ইসলাম* বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আমি *'জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা'* প্রবন্ধে লিখেছিঃ

> 'খলিফা আল মামুন, খলিফা হারুন উর রশিদ এর শাসনামলে আমলে বাগদাদের পরিচিতি ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা মন্দির হিসেবে। খৃস্টান-ইহুদী-মুসলমান মনীষীরা পাশাপাশি বসে জ্ঞান চর্চা করতেন। যুক্তিবাদী ধারার এ সমস্ত মুসলিম মনীষীরা পরিচিত ছিলেন মুতাজিলা (Mutazilities) নামে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুদবাইয়ের মনতব্য প্রণিধান যোগ্যঃ '.....ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ- ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। 'সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্ন-সমর্পন ব্যতিত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই'--নিয়তীবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচারন করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষনশীলতার পুনাবির্ভাব ঘটে। আল-গাজালি যুক্তির স্থলে দৈব বাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যত জানার শক্তি নেই, কেবল স্রষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম , খ্রীস্টান এবং ইহুদী মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞান -চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবনতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণু-তা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালেদুন।' '

আফসোস ও লজ্জার কথা- *ক্লাসিক্যাল ইসলামের* কথা জামিলুল বাসার সাহেবকে শুনতে হল আমার মত একজন অভাজন নাস্তিকের কাছ থেকে। আমি আর ও উল্লেখ করেছিলাম, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর মুসলিমরা আধিপত্য লাভ করেছিল *ঐতিহাসিক কারণে।* ভদ্রলোক এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, জামিল সাহেব ভেবেছেন, *ইউরেকা! ধরেছি ব্যাটাকে! এটাই আসল জায়গা। নিশচয়ই জাহেদ আহমদ ক্লাসিক্যাল ইসলাম এবং ঐতিহাসিক কারণের আড়ালে আসল কথা লুকাচ্ছে অর্থাৎ মহাগ্রন্থ ক্বোরাণের মধ্যে আড়ালে-আবডালে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে।* এবার বলি- আসলে *ঐতিহাসিক কারণ* দ্বারা আমি কি বুঝাতে চেয়েছিলাম। আবার ও আমার প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে (ভদ্রলোক ভুলে ও প্রবন্ধটি একবার পড়ে দেখার চেষ্টা করেননি, তাহলে অনেক উত্তর পেয়ে যেতেন কারণ আমি ওখানে যা বলেছি, তা স্পষ্ট রেফেন্সের ভিত্তিতেই বলেছি)।

> মুসলিম মনীষীরা মিশরের লাইব্রেরী গুলোতে দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা ও পুরানো গ্রীক পুস্তক ভান্ডারের সন্ধান পেলে তাঁরা তখন খ্রীস্টান অনুবাদকদের দ্বারস্থ হন। খ্রীস্টান অনুবাদকরা গ্রীক বই গুলোকে প্রথমে তাঁদের স্থানীয় সিরিয়াক (Syriac) ভাষায় এবং পরবর্তীতে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইহুদী, মুসলমান ও খৃস্টান মনীষীদের পাশাপাশি বসে জ্ঞান চর্চ্চা করার যে উৎকর্ষময় সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সে সময় বিরাজমান ছিল, আজকের বাস্তবতায় তা রূপেকাহিনী বলে মনে হতে পারে। জ্ঞান চর্চ্চার মূল্যায়ন মুসলমানদের মাঝে সে সময় এত বেশি ছিল যে, প্রচলিত আছে— খলিফা আল মামুন তাঁর সময়ের সেরা অনুবাদক খৃস্টান ধর্মী হুনায়িন বিন ইশাক এর পারিশ্রমিক দিতেন অনুবাদকৃত বইয়ের সম পরিমাণ ওজনের স্বর্ণ দ্বারা। কালক্রমে এই সব আরবী পুস্তক গুলি সিরিয়া, সিসিলি ও স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। এ গুলি তখন আরবি থেকে ল্যাটিন (মধ্য যুগের ইউরোপের ভাষা) এ অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ, অনুবাদের ক্রম ছিল গ্রীক—>সিরিয়াক—>আরবী—>ল্যাটিন—>ইংরেজী। এ কথাটি তাই মোটে ও অতিরঞ্জিত নয় যে, ইউরোপীয়রা মূলতঃ আরবদের মাধ্যমেই গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ পায়।

আশা করি, জামিল সাহেব পুরো প্রবন্ধটি একবার পড়ে নেবেন।

দ্বিতীয় কিস্তির জবাবের শেষ দিকে জামিলুল বাসার আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন, যে গুলি, তাঁর মতে, আমাকে ধারণা দিবে *ক্বোরাণে বিজ্ঞান আছে কি নেই!* প্রশ্নগুলি হচ্ছেঃ *জ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান কাকে বলে? পরস্পরের সম্পর্ক কি? কোনটি আগে, কোনটি পরে? কে কার গুরু। জ্ঞান ও বিজ্ঞান কত প্রকার কত প্রকার এবং কি কি? ভাববাদ কাকে বলে? জ্ঞানের সঙ্গে উহার সম্পর্ক কি? বিজ্ঞানের উৎস কি? আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা, এলেম .....ইচ্ছা ও জ্ঞানের আকৃতি বা অনু-পরমাণু বা কোষের রুপ কি? ইত্যাদি।*

-দেখা যাচ্ছে, বাসার মহাশয় বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, মেটাফিজিক্স সব এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। নিঃসন্দেহে এগুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সব সময়ের সকল চিন্তাবিদ মানুষকেই ভাবিয়েছি এবং আজ ও ভাবাচ্ছে। তবে যেহেতু এই প্রশ্নগুলির সবগুলি আমাদের বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু 'ক্বোরাণ ও বিজ্ঞান' এর সাথে সম্পৃক্ত নয় (যেমনঃ ভাববাদ), আমি সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি না। আপাততঃ আমাদের মধ্যে ফায়সালা হওয়া দরকার, ক্বোরাণে সত্য বিজ্ঞান আছে কি-না। সেই দৃষ্টিকোন থেকে আমি কেবল মূল বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

বিজ্ঞান কি? এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে, কাজেই বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই- তা সে যে ভাষায়ই আপনি প্রকাশ করেন না কেন। কিন্তু 'জ্ঞান কি', বা 'সুশিক্ষা কি', কিংবা- 'ভাল মানুষের সংজ্ঞা কি' ইত্যাদি বিষয়গুলির অনুরূপ কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই, সে জন্য মনীষী-দার্শনিকেরা যুগে যুগে এ গুলি নিয়ে বিতর্কে মেতেছেন, আজ ও চলছে সেই বিতর্ক। যাই হোক, এবার দেখা যাক - *বিজ্ঞান কি?* 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই মোটামোটিভাবে বিজ্ঞান বলা হয়।' অর্থাৎ, 'বিজ্ঞানের বেলায় ব্যক্তিগত মতামত তুচ্ছ, গৌণ; আপনাকে দেখাতে হবে আপনি যা বলছেন তা গবেষণা ও প্রমাণসিদ্ধ যাতে পৃথিবীর যে কোন স্থানের বিজ্ঞানীর পক্ষে বর্ণিত পন্থায় গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। কোনটি বিজ্ঞান, আর কোনটি বিজ্ঞান নয়– তা নিরূপণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি, যাকে ইংরেজীতে replicability বলা হয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যেমনঃ মুহম্মদের কথিত *মি'রাজের কাহিনী*, বা *'যীশুর পুনরুত্থানের কাহিনী'* এ জন্য বিজ্ঞান নয় কারণ এটি কখনোই কোন বিজ্ঞানী কর্তৃক তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক কোন ভাবেই প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। একি রকম কথা বলা যায়- *'স্বপ্নে পাওয়া গাছ দিয়ে চিকিৎসা'* জাতীয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত পীর-তান্ত্রিকদের প্রতরণামূলক বিজ্ঞাপণ সম্পর্কে। প্রশ্ন আসতে পারে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় কি ভুল হতে পারে না? কিংবা, বিজ্ঞানের কথাই কি সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে মানতে হবে? উত্তরে বলবঃ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয় ও; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী বা তাঁর তত্ত্বকে যদি অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা) দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে প্রথম বিজ্ঞানীকে নতুন তথ্য-উপাত্ত-ফলাফলের ভিত্তিতে তার থিওরী অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে- তা তিনি প্রফেসর স্টিফেন হকিংনস বা, ডঃ কদম আলী যেই হোন না কেন। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্টটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে, তা হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সে জন্যই বলেছি, বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের এটিই মূল তফাৎ। ক্বোরাণ অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয়; বিজ্ঞান তা নয় কেননা পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর সতত পরিবর্তনশীল সেই প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে বিজ্ঞানের মহান লক্ষের একটি।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান কত প্রকার কত প্রকার এবং কি কি?

-প্রাইমারী স্কুলের যে কোন একটি *সাধারণ বিজ্ঞান* বইয়ে চোখ বুলালে জেনে যাবেন, বিজ্ঞান কত প্রকার ও কি, কি। তবে জ্ঞানের প্রকারভেদ নিয়ে এখানে মন্তব্য করব না (কারণ আগেই বলে দিয়েছি)।

আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা, এলেম .....ইচ্ছা ও জ্ঞানের আকৃতি বা অনু-পরমাণু বা কোষের রুপ কি? ইত্যাদি।

-কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সকল কোষেরই নির্দিষ্ট আকার আছে, মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখা ও যায়। অনু-পরমানুর ও আকার রয়েছে। অন্যদিকে *আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা, এলেম* ইত্যাদি ডাইমেনশনলেস অনুভূতি মাত্র। তুলনাটা বেমানান হয়ে গেল না? *আটঃ*

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ও মুহম্মদের লাখ লাখ উম্মত মনে করে, তিনি সাধারণ রক্ত মাংসের কোন মানুষ ছিলেন না—ছিলেন তথাকথিত *নূরের* তৈরী (এক-ই কারণে বাংলাদেশে মোল্লারা একবার দাবী তুলেছিল, হাই স্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলী লিখিত 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ করার জন্য, যদি ও লেখাটি মুহম্মদের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল)। মুহম্মদের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল--দেশেতো বটেই, এমনকি প্রবাসে ও বাংগালী মুমিনরা এসব বয়ান শোনার জন্য সাঈদী জাতীয় মোল্লাদের হাজার হাজার পাউন্ড-ডলার খরচ করে ভাড়া করে নিয়ে আসে। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, কেবল সৌরজগতের একা (মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগৎ নিয়ে তৈরী এক একটি গ্যালাক্সী আর মহাবিশ্বের এ রকম বহু বিলিয়ন গ্যালাক্সির একটি -মিল্কিওয়ে-তে আমাদের সৌরজগত অবস্থিত) রয়েছে কমপক্ষে ২১ টি উপগ্রহ বা চাঁদ *(সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফী)*। নিশচয় সে সময় এই ২১ টি চাঁদের খবর জানা থাকলে আজ আমরা শুনতাম- মুহম্মদের আঙ্গুলের ইশারায় ২১টি চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল! উম্মতদের তখন নিশ্চয় সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হত ভাবাবেগের ঠেলায়।

আমি জানি, জামিলুল বাসার সাহেব উপরে বর্ণিত সাধাসিধে উম্মতকুল এবং মোল্লা দলের চাইতে নিজেকে আলাদা ভাবতে ভালবাসেন। কিন্তু সেই তিনি ও মনে করেন- মুহম্মদ *ভাববাদী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ছিলেন* (একের মাঝে সব, নাকি একই অঙ্গে বহুরূপ?)! প্রশ্ন আসে, তাহলে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, ডারউইন প্রমুখদের সাথে তথাকথিত *ভাববাদী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক* মুহম্মদের পার্থক্য কোথায়? জামিল সাহেব, প্লিজ উত্তর দিবেন। মনে রাখবেন, এখানে সলিড বিজ্ঞানীর কথা বলছি। কোন ও ভাববাদী দার্শনিক এর প্রসংগে যাচ্ছি না।

শেষ কথাঃ

ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অতি-প্রাকৃতিক কাহিনী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে অনেকে আমাকে প্রায় সময়ই এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেনঃ *ভাই, যার যার বিশ্বাস তাঁর কাছে। কেন খামোখা মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে তাঁদের কষ্ট দেন?* বলতে ইচ্ছা হয়, মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে যাঁরা চিত্তে সুখ অনুভব করেন, তারা *স্যাডিস্ট* এবং আমি মোটে ও তাদের একজন নই। *তবে কেন আমি ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এত কথা লিখছি? এতে কি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে না?* প্রশ্ন আসতেই পারে। আর তার জবাব ও রয়েছে।

আগে ও লিখেছি, মুসলমানরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মোটে ও চট্টিখানি কথা নয়। এক বিলিয়নের মত মুসলমানদের ঘরে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা কত হত পারে? নিশ্চয়ই তা সংখ্যার মাপে বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই কয়েক শত কোটি শিশু-কিশোরেরা কি করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যদি তাদের মাতা-পিতা, গুরুজনদের সকলেই জামিলুল বাসারের মত বিশ্বাস

করেন যে, *আল-ক্বোরাণেই রয়েছে বিজ্ঞান* এবং *মুহম্মদ একজন ভাববাদী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ছিলেন* ? তাঁরা কি জবাব দেবেন (বা দিচ্ছেন) যদি তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের ক্লাশ এটেন্ড করে এসে জিজ্ঞাস করেঃ আচ্ছা, আব্বু-আম্মু, বিজ্ঞানের কার্য-কারণ ***(cause and effect)*** নীতির সাথে ক্বোরাণে বর্ণিত *আদম-হাওয়া-শয়তান, ফুঁক দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি কি* মেলে ? কিংবা, ঝড়-বৃষ্টিতো প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে, এর সাথে ফেরেস্তা মিকাইলের কি সম্পর্ক? আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়, মুসলমান বাবা-মায়েরা এসব প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন তাদের সন্তানদের। তাঁরা কি বলেন, 'বিজ্ঞানের ক্লাশে যা শিখেছো সব মিথ্যে আর ক্বোরাণের বর্ণনাই সত্যি?' নাকি, 'বিজ্ঞান এবং ক্বোরাণ দুটোই সত্যি?' এই দুটো উত্তরই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, সকলে না হলে ও মুসলমান মাতা-পিতার অন্তত কেউ কেউ সন্তানদের সামনে সত্য গোপন করাটাকে প্রশ্রয় দেন না এবং সরাসরি বলে দেন, '*কার্য-কারণ* নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে ক্বোরাণের কোন মিল নেই। মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়।' যে সব মাতা-পিতা এই সত্যটি তাঁদের সন্তানদের কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই বলার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা কেবল নিজেদের সন্তানদের সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা বিকাশের পথটিই সুগম করেন না; আমার বিশ্বাস, তাঁরা এ ক্ষেত্রে মানবতার ও একটি উপকার করছেন। কেননা, আমরা সবাই জানি, আগামী দিনের সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা আজই শুরু করতে পারি, তা হচ্ছে- আমাদের নতুন প্রজন্মকে সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।

ভালোবাসা থাকলো সকলের প্রতি।

———-

নিউ ইয়র্ক
২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

* http://www.mukto-mona.com/Articles/jamilul_bashar/Jahed_Ahmed-2.pdf

লেখকের পরিচয়ঃ মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মর্ডারেটর। বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স।

তথ্য তালিকাঃ

উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য নিচে উপরের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধ, বই এবং ওয়েব সাইটের উল্লেখ করছি। লক্ষ করুন, এগুলি কোনক্রমেই এ বিষয়ে পূর্ণাংগ কোন তালিকা নয়।

১ *জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা* -জাহেদ আহমদ (মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যে মুসলমানদের অগ্রগতি সম্পর্কে মোট চার পর্বের প্রবন্ধ)

২ *বিজ্ঞানময় কিতাব* -অভিজিৎ রায় (ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজার উপর ব্যাংগাত্মক, চিত্তাকর্ষক এবং তথ্য সমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ)

৩ *যে গল্পের শেষ নেই* -দেবী প্রাসাদ চট্টোপাধ্যায় (মানুষ, ধর্ম এবং পৃথিবী সৃষ্টির উপর সরল কিন্তু অপূর্ব ভংগীতে লেখা ছোট একটি বই)

৪ www.secularislam.org (ক্বোরাণ, হাদিস এর উৎস, অন্তর্গত অসংখ্য গোঁজামিল-এর প্রমাণ এবং ইসলামের ইতিহাসের অনেক বিদ্রোহী নাস্তিক ও মানবতাবাদীদের রচনা সমৃদ্ধ একটি ওয়েব সাইট)

৫ www.csicop.org (বিজ্ঞান, এর কার্য প্রণালী এর সাথে বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত অসংখ্য ভূঁয়া বা অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানের পার্থক্য এবং ব্যাখ্যা বিষয়ক ওয়েবসাইট)

৬ http://www.wvinter.net/~haught/ (উপরের মত)

৭ *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality* by Pervez Hoodbhoy *(a book)*

৮ *http://science-education.nih.gov/home2.nsf/ (general science education)*